দূরান্ত দ্রাঘিমা

ইতিহাসবিদের কলমে উপন্যাস ও রম্যরচনার সংকলন

নিমাইসাধন বসু

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

স্মৃতি-বিস্মৃতির আলো-আঁধারিতে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়ে নিমাইসাধন কিছু দিন হাওড়ার বি. কে. পাল ইন্সটিটিউশনের ছাত্রদের পড়িয়ে (বিনা পারিশ্রমিকে) লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা ও ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের উদ্দেশ্যে জাহাজে চেপে বিদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন, সেকথা সবাই জানেন।

তখন বিদেশ ভ্রমণ করতে গেলে একমাস কাল জাহাজে বহু যাত্রীর সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হত এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের সংস্পর্শে এসে সবাই বন্ধু লাভ করত। নিমাইসাধনের সঙ্গে জাহাজে কলকাতার কিছু বন্ধুদের নাম আছে তাদের মধ্যে রানি রাসমণির পরিবারের গোকুল দাস আছেন — অজয় দাস বলে আরো একটি বন্ধুর নাম আছে। সেই সময় থেকে, জীবনকেWide angle lense-এর মধ্যে দিয়ে দেখতে শুরু করা ও জীবনের প্রথম নানা যাত্রীর সঙ্গে মেলামেশার রোমাঞ্চ তরুণ নিমাইসাধনকে অনেক পরিণত জীবন রসিক করে গড়ে তুলছিলেন তার অদৃশ্য ভাগ্যবিধাতা।

ডক্টর এ, এল ব্যাশমের অধীনে দুই বছর ধরে একটি গবেষণামূলক থিসিস লিখে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রি পেলেন 'স্কুল অফ্ ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বইটি 'মধ্যভারতের চন্দেলবংশের উত্থান' বিষয়ে গবেষণাধর্মী ইতিহাস। যাদের পরিচয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায়নি সেযাবৎ ঐ সব মানুষেরা স্থানীয় ভিল, ভড়, গন্ড যারা নিজেদের মধ্যেই জীবন যাপন করত কিন্তু তাদের পরিশ্রমী দেহ ও কিছু তৈরি করার দক্ষতা ছিল অপরিসীম। তারই ফলে মধ্যভারতের খাজুরাহো সাত্না পান্না অঞ্চলে তাদের অধিকারে এল। এবং তারা রাজা উপাধি নিয়ে রাজত্ব করতে শুরু করল। এরা মেবার, বা চিতোর জয়সলমীর অর্থাৎ রাজপুতানার অধিবাসীও নয় এবং অন্য অঞ্চল থেকেও তারা মধ্যপ্রদেশে এসে রাজত্ব বিস্তার করেনি। দুঃখের বিষয়, নিমাইসাধনের গবেষণামূলক গ্রন্থ, চন্দেল বংশের ইতিহাস 'THE CHANDELLAS' এই বইটি প্রথম ছাপা হয়েছিল FIRMA K.L.M. থেকে। তখন এই ব্যবসায়ী কানাইলাল মুখোপাধ্যায়ের ছাপাখানার প্রথম বই ছাপানো হল — নিমাইসাধনের এবং ওঁদের ছাপাখানার প্রথম যন্ত্রস্থ বইটি

ছিল তাঁরই। কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানে আজ একটি বই-ও খুঁজলে পাওয়া যাবে না। এটি খুবই দুঃখের বিষয়।

নিমাইসাধন, গবেষণা শেষ করে একমাস কাল যাবৎ ইউরোপে ঘুরে স্বদেশে ফিরে এলেন জাহাজে ও ট্রেনে করে হাওড়ায়।

ষাটের দশকের ভারতীয় ও ইংরেজ মানসিকতা যা তখনও সাধারণ মানুষের মানদণ্ডে উভয় সংস্কৃতির তুল্যমূল্য না হলেও সর্বাংশে মানবিক! আজকের মতো যান্ত্রিক নয়। এই উপলব্ধির জগৎ নিয়েই টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনা সাজানো একটি রম্যরচনা প্রকাশিত হয়। নামকরণ করেন বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার প্রথম লেখায় এই নামটি ভুলবশত অন্য অধ্যাপকের নামে লেখা হয়েছিল। তার জন্যে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। প্রথম বইটির নাম উপল উপকূলে — প্রচ্ছদ অঙ্কন করেন হাওড়ার তরুণ শিল্পী শ্রী বিমানচাঁদ মল্লিক। এই তথ্য আগেও দেওয়া হয়েছিল।

এই বইটির প্রধান উপজীব্য বিষয়, নিমাইসাধনের বিদেশের পরিবেশে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া — হাতেকলমে কাজ শেখার চেষ্টা ও মানুষকে তার নিজস্ব পরিবেশে চেনা ও জানা। নিমাইসাধনের পরবর্তী জীবনে তাকে অনেক পরিণত ও অভিজ্ঞ করে তুলতে সাহায্য করেছিল যা সারাজীবন ধরে সে তার সদ্ব্যবহার করতে পেরেছিল। দ্বিতীয় বইটি একটি বড়ো গল্প আকারে পঁয়তাল্লিশ বছর আগে মাসিক পত্রিকা 'জয়শ্রী'তে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল চার পাঁচ মাস ধরে। 'জয়শ্রী' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাত্রী সম্পাদিকা লীলা রায়। এই বইটির নামকরণ করেছিলেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ১৯৬০ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নিমাইসাধন তখন ইতিহাস বিভাগে ও অলোকরঞ্জন তুলনামূলক সাহিত্যের লেক্‌চারার। তখন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ভাইসচ্যান্সেলর ছিলেন শ্রী ত্রিগুণা সেন মহাশয়। 'জয়শ্রী' পত্রিকায় লেখাটি বেরোয় কবি অলোকরঞ্জনের সহায়তা ও পরামর্শে। সেই লেখা এতদিন পরে বই আকারে বেরোচ্ছে। আমার অনুরোধে বর্তমানে 'জয়শ্রী'র সম্পাদক মশাই শ্রী বিজয় নাগের সহায়তায় তিনি অসাধ্য সাধন করে সবকটি পত্রিকার অংশ থেকে গল্পটি দাঁড় করিয়ে Photo Copy করে আমায় সযত্নে Speed Post এ পাঠিয়ে দিয়ে সকলের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

বই আকারে দুটির প্রেক্ষাপট ইংল্যান্ড এবং একই সময়ের বিভিন্ন ঘটনার বৈচিত্র্যময় বিবরণে লেখাগুলি প্রাণবন্ত! এই টুক্‌রো টুক্‌রো মুহূর্তগুলি কাল্পনিক নয়, লেখকের নিজস্ব অভিজ্ঞতায় ও তরুণ শিক্ষার্থীর চোখ দিয়ে একটি নতুন দেশের মাটিকে চিনে নেওয়ার আগ্রহ পরবর্তী জীবনে তা শুধু যে কাজে লেগেছিল

বলা বাহুল্য সেই দেশটি তার দ্বিতীয় মাতৃভূমিও হয়ে দাঁড়িয়েছিল বোধহয়! দুটি লেখাতেই দেশের বন্ধুরা আছেন—যারা ওদেশে একই সঙ্গে পড়াশোনা করতে ইংল্যান্ডে গেছেন। মিস্টার ও মিসেস কিটি পেন্‌সন আছেন — ক্যাপ্টেন কুক্ ও তাঁর স্ত্রী আছেন। একটি ইংরাজ পরিবারের সান্নিধ্যে এসে নিমাইসাধন পরবর্তী জীবনে বহুভাবে উপকৃত হয়েছিলেন। Mrs. Pension নিমাইসাধনের বিদেশবাসিনী 'মা' হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৬৬ সালে আমরা তিনজনে ইউরোপ হয়ে ইংল্যান্ডের Muswell Hill এর বাড়িতে মিলিত হই তখন পরিবারের প্রাণপুরুষ Mr. Pension বিগত। ছেলেমেয়েরা বড়ো হয়ে নানা কাজে ও পড়াশোনা এবং জীবিকার বিচিত্রতায় দূরে সরে গেছে। তখনও Mrs. Kitty Pension নিমাইসাধনের অতি কাছের মানুষ — অতি চেনা মূর্তিমতী নারী যিনি চিরকালের মায়ের ভূমিকায় থাকেন। আমরা কাছেও তাঁর স্নেহময়ী মাতৃভাবে ও অতি কাছের মানুষ হয়ে উঠেছেন মুহূর্তের মধ্যেই। তখন শ্রীমান সুপ্রতীক নেহাতই ছোট্ট মানুষ! চকোলেট ও কেক্ নিজে হাতে তৈরি করেন বরাবর — দু'হাত ভরে সুপ্রতীককে খুশি করেছিলেন।

পটপরিবর্তন হচ্ছে — এখন সুপ্রতীক ডাক্তার — বিবাহিত, মৌসুমী পুত্রবধূ ও শ্রীতমা (কন্যা) সকলের সঙ্গেই তাঁর সখ্য। প্রাণভরা ভালোবাসা দিয়ে নিমাইসাধনের পুরো পরিবারকে আপন করে নিয়েছেন।

আমাকে দেখলেই হয়তো মনে মনে নিজের পুত্রবধূর জায়গায় বসিয়ে ছবি আঁকতেন এবং বারবার হাত ধরে বলতেন — তুমি আমার বাড়িতে থাকবে এসে।

নিমাইসাধনকে 'নিমি' বলতেন। 'নিমি, এর পরের বারে লীনাকে আমার কাছে রেখে যেও — আমরা খুব গল্প করব আর বেড়াতে যাব।' প্যাকেট ভর্তি করে নানা লোভনীয় খাদ্যের সম্ভার — চকোলেট, কুকি, কেক্ 'রামের' মিশেল দেওয়া — চকোলেট ফাজ্ — পেস্ট্রি সব গুছিয়ে সঙ্গে দিয়ে দিতেন।

শেষবার ২০০৩ সালে ইংল্যান্ড ও ইউরোপ ট্যুর করে ফিরে হাওড়ায় এলাম এপ্রিল মাসে। এরপরই নিদারুণ সংবাদ এল — মিসেস পেন্‌সান চলে গেছেন। সেই বছরেই তার বড়ো ছেলে Ralph ও পুত্রবধূ Jenny-এর বাড়িতে আমরা সবাই মিলে সকালে lunch খেয়ে আনন্দ করে ফিরে ছিলাম সবাই মিলে। তখন Mrs. Pension বড়োছেলের সঙ্গে থাকতেন। আশাকরি, এই ঘটনাগুলি লেখার মূল্য বোঝা যাবে ভেবে বিশদভাবে বর্ণনা দেওয়া হল। বইদুটির রচনাকাল ও লেখকের মানসিকতা বুঝতেও সুবিধা হবে।

দূরান্ত দ্রাঘিমার প্রচ্ছদপট ও উপল উপকূলের প্রচ্ছদ এবার নবরূপে করার দায়িত্ব 'পুনশ্চ' প্রকাশনার সন্দীপ নায়ককে দেওয়া হয়েছে। নিমাইসাধনের প্রতি

সন্দীপের আন্তরিক শ্রদ্ধা তাকে এই কাজে ব্রতী করেছে ভেবে আমি খুব আনন্দিত। সন্দীপ নায়ক এই বই দুটির যৌথ প্রকাশনায় আগ্রহী হওয়ায় আমিও নিশ্চিন্ত যে নিমাইসাধনের প্রথম দুটি রচনা পাঠক-পাঠিকারা হাতে পাবেন। সেই কারণে সন্দীপ নায়ক ও 'পুনশ্চ' প্রকাশনাকে আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ জানাই।

ডিসেম্বর, ২০০৫
হাওড়া,

লীনা বসু

সূচিপত্র

উপল-উপকূলে	.....	১৩-৭৮
লন্ডনে প্রথম দিন	.....	১৭
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু	.....	২৩
বিলেতে বড়োদিন	.....	২৯
বিলেতে বাঙালি পিয়ন	.....	৩৩
এক্সকিউজ্ মি প্লিজ	.....	৪১
লস্ট প্রপার্টি অফিস	.....	৪৫
পেয়িং গেস্ট	.....	৪৭
অসময়ের বন্ধু	.....	৫২
ফ্রি-বেড	.....	৫৫
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একদিন	.....	৬৩
অতীত সন্ধানে	.....	৬৯
উপল-উপকূলে	.....	৭২
দূরান্ত দ্রাঘিমা	.....	৭৯-১৬০

উপল-উপকূলে

ভূমিকা

আজকাল এত লোক বিদেশে যাচ্ছেন ও বিদেশ সম্বন্ধে এত বই লেখা হয়েছে যে নতুন কিছু লেখবার আছে বলে মনে হয় না, বিশেষ করে ইংল্যান্ডের কথা। কিন্তু ও দেশ থেকে ফেরবার পর বিভিন্ন আলোচনা সভা ও বৈঠকে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলবার সময় লক্ষ করে দেখেছি, বিদেশ সম্বন্ধে এখনও জানবার কৌতূহল কী অসীম। হাওড়া রবীন্দ্রসমিতির পর পর কয়েকটি সাপ্তাহিক অধিবেশনে লন্ডনে আমার ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে কয়েকটি লেখা পাঠ করি। পরে বিভিন্ন পত্রিকায় কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। তখন পর্যন্ত সবকটি লেখা একত্র করে প্রকাশের কথা চিন্তা করিনি। কিন্তু সাহিত্যরসিক বন্ধুরা এ বিষয়ে খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন। বিশেষ করে শ্রীযামিনীকান্ত সোম, শ্রীবিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রী অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীহরিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎসাহ ও পরামর্শে লেখাগুলি একত্রে প্রকাশ করা স্থির হয়। বইটির নামকরণ করে দিলেন অসিত বাবু।

বিদেশে আমার দুবছরের ছাত্র-জীবনের যে সব ঘটনার উল্লেখ করেছি, সেগুলি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। এই বই-এর সবকটি রচনাই ছাত্র-মন ও দৃষ্টি নিয়ে লেখা। লন্ডনের ছাত্র-জীবন সম্বন্ধে সচরাচর যা জানা যায় না, এমন কতকগুলি দিকের কথা তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি। কতটা সফল হয়েছি তা পাঠকরাই বিচার করবেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলে রাখি — 'বিলেত দেশটার সব ভাল' বলার দলে আমি নই। অনেক কিছুই দেখেছি যা মোটেই ভালো লাগেনি। কিন্তু ইচ্ছে করেই সেগুলির উল্লেখ করিনি। ইংরাজ দেশ, মানুষ ও সমাজের যেগুলি ভালো লেগেছে সেই সব বিষয়েরই আলোচনা করেছি।

শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ বইটি প্রকাশ করে ও শ্রীগৌরীশঙ্কর সরকার অল্প সময়ে মুদ্রণের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞ করেছেন। প্রচ্ছদপদ এঁকেছেন প্রীতিভাজন শ্রীবিমান চাঁদ মল্লিক। তাকেও ধন্যবাদ জানাই।

সবশেষে উল্লেখ করতে হয় দুজনের — যাদের উৎসাহ, আগ্রহ ও তাগিদ না থাকলে এই বই বোধ হয় লেখা হোত না। এঁরা হলেন লীনা বসু ও শ্রীশোভন বসু। প্রথমোক্তকে ধন্যবাদ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, আর বন্ধুবর শোভন ধন্যবাদ-বিরোধী।

নিমাইসাধন বসু

রথযাত্রা ১৩৬৫,
হাওড়া।

লন্ডনে প্রথম দিন

বছর কয়েক আগে হাজারিবাগ থেকে বম্বে মেলে হাওড়ায় আসছিলাম। এমনিতেই ট্রেনটা ছিল প্রায় ঘণ্টা তিনেক লেট। তার ওপর বর্ধমানের পর থেকে মেলের গতি প্রায় সাইকেলের পর্যায়ে এসে দাঁড়াল। যাত্রীরা ক্রমশ অধৈর্য হয়ে পড়েছে।

একজন বললেন, "এ যে গুডস-এর অধম হয়ে পড়েছে।"

"গুডস্ নয় মশাই, গুডস্ নয়— এ আমতা প্যাসেঞ্জার", বললেন আর একজন যাত্রী। কোন্নগরের কাছাকাছি এসে ট্রেনটা গেল থেমে। সব যাত্রীরই তখন ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। একজন বলে উঠলেন, "এর চেয়ে হেঁটে যাওয়া ভালো। ট্রেন খারাপ হয়ে গেছে। চলুন সবাই মিলে ঠেলে নিয়ে যাই।" বাঙ্কের ওপর থেকে স্যুটপরা এক যাত্রী মন্তব্য করলে, "ইংরেজ দেশ ছাড়ার পর কী হালই হয়েছে। হত বিলেত— ও দেশে ট্রেন তো নয় যেন বিদ্যুৎ।"

"ওদের কথাই আলাদা, ঘণ্টায় সত্তর আশি মাইল স্পিডে ট্রেন চলে", সায় দিলেন অপর একজন যাত্রী।

শুধু এই ঘটনার জন্য নয়, এমনিতেই লিভারপুল থেকে লন্ডনগামী ট্রেনে উঠেছিলাম ইংল্যান্ডের ট্রেনের গতি সম্বন্ধে খুব উচ্চাশা নিয়ে। থার্ড ক্লাস কামরার সিটে পুরু গদি, আর্মরেস্ট, টেবিল, অ্যাশট্রে, ঝকঝকে বাথরুম, দেয়ালে সুদৃশ্য ছবি ও সংলগ্ন করিডর দেখে মনে হল, সত্যি বিলেতি ট্রেন বটে। আমাদের ফার্স্ট ক্লাসকেও হার মানায়। শুধু যদি ভাড়াটা আমাদের থার্ড— নিদেন ইন্টার ক্লাসের মতো হত।

ট্রেনের স্পিড সম্বন্ধে কিন্তু আশাভঙ্গ হল ট্রেন ছাড়ার অল্পক্ষণের মধ্যেই। ষাট-সত্তর মাইল তো দূরের কথা, ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল স্পিড ছিল কিনা সন্দেহ। লিভারপুল থেকে লন্ডনের ইউসটন স্টেশন পৌঁছতে লাগল প্রায় সাড়ে পাঁচঘণ্টা। তাও মাঝখানে অন্য কোনো স্টপ ছিল না। ট্রেনে হতাশ হবার আরও একটা কারণ ছিল। ডাইনিং কারে খেতে গেছলাম সাড়ে সাত শিলিং দিয়ে মানে প্রায় পাঁচ টাকা। কিন্তু যা খেলাম তার দাম পাঁচ সিকের বেশি হওয়া উচিত নয় কোনো মতেই। খানিকটা স্যুপ, কড়াইশুঁটি সেদ্ধ, আলু সেদ্ধ, কপি সেদ্ধ, গাজর সেদ্ধর মাঝখানে একটুকরো মুরগির মাংস (তাও সেদ্ধ!), একটা আইসক্রিম ও মেজার গ্লাসের মতো ছোটো কাপে এক কাপ কফি খেয়ে পকেট খালি হলেও পেট ভরল না।

লন্ডনের ইউসটন স্টেশনে ট্রেন যখন পৌঁছল তখন বেলা প্রায় সাড়ে তিনটে। বেশ ঠান্ডা; তার ওপর বৃষ্টি পড়ছে। আকাশ একেবারে মেঘাচ্ছন্ন, অন্ধকার। ট্রেনে এক ইংরাজ অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তিনি বললেন, "It is not a very fine day in London. It is really bad." ভদ্রলোকের কথার মধ্যে যেন 'এপোলজি' চাওয়ার ভাব প্রকাশ পেল।

স্টেশনে আমার ন'দার তিন বন্ধু রঞ্জিত, অলোক ও প্রভাতদা আমায় 'রিসিভ' করতে এসেছেন দেখলাম। বাড়ির সব খবরাখবর জিজ্ঞাসার পর রঞ্জিতদা প্রশ্ন করলেন, "কতদিন থাকবে বিলেতে?" বললাম, "ইচ্ছে আছে দু'বছর; তারপর দেখা যাক্।" "ফিরে যাবে না তো?" মনের কথা সব সময় মুখে বলা যায় না, বিশেষ করে বিলেতে তো নয়ই। তাই উত্তর দিলাম, "ফিরে যাব বলে তো আসিনি।"

আমার থাকার ঠিক হয়েছিল Y.M.C.A. পরিচালিত ইন্ডিয়ান স্টুডেন্টস হোস্টেলে— ২৬, উবার্ন স্কোয়ার। একটা ট্যাক্সি করে হোস্টেলে উপস্থিত হলাম। হোস্টেল অফিসে এক ভারতীয় ভদ্রলোককে রঞ্জিতদা জিজ্ঞাসা করলেন, "মামা কোথায়?" "ওপরে আছেন, ডেকে দিচ্ছি।" আমি তো অবাক— এই 'ম্যামি-ড্যাডি'র দেশে মামা এল কোথা থেকে? একটু পরেই জানলাম 'মামা' আর কেউ নয়— হোস্টেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ডক্টর মালাই পেরুমল স্বয়ং। লন্ডনে ভারতীয় ছাত্র-সমাজে ইনি 'মামা' নামে সুপরিচিত। 'মামা' কিন্তু নবাগত 'ভাগ্নে'র প্রতি খুব সদয় বলে মনে হল না। আমার হোস্টেল রিজার্ভেশন রিসিটটা দেখে বললেন, এর কোনো দাম নেই। আমার নাকি জাহাজ থেকে হোস্টেলে চিঠি দেওয়া উচিত ছিল। অর্থাৎ মামার বাড়ি আসার আগে ভাগ্নেদের মামাকে আর একবার জানানো উচিত। শেষ পর্যন্ত আমায় তিনি হোস্টেলের ট্রানসিট রুমে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। তাও আবার টেম্পোরারি বা অস্থায়ী। স্থায়ী ব্যবস্থা বর্তমানে সম্ভব নয়। হলেও কবে হবে বলা যায় না।

মামার বাড়ির আপ্যায়নে মন খারাপ হয়ে গেল। ডক্টর পেরুমল আমায় নিয়ে গেলেন ট্রানসিট রুমে এবং দশ শিলিং জমা নিয়ে ঘরের ও বাইরের দরজার চাবি বুঝিয়ে দিলেন।

থাকার ব্যবস্থা দেখে রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে পড়লাম। ছোটো ঘরে চারটি খাট— ফোর বেডেড রুম। আসবাবপত্রের কোনো বালাই নেই। একটা নড়বড়ে কাঠের আলমারিতে জামা-কাপড় রাখবার ব্যবস্থা রয়েছে। ঘরের মাঝখানে একটা শ্রীহীন কাঠের টেবিল। খাট বা খাটিয়ার অবস্থা একইরকম। ঘরে ঢুকলেই এই শ্রীহীনতা চোখে পড়ে। এই ঘরে থাকতে হবে ভেবে মন একেবারে খারাপ হয়ে গেল। কোথায় কল্পনা করে এসেছিলাম ইংরাজি কায়দায় সাজানো ঘর— খাট, বেডসাইড টেবিল, রাইটিং টেবিল, ওয়ার্ডরোব, দেয়ালে টাঙানো সুন্দর ছবি; আর

এসে পড়লাম এ কোন জেলের সেলে! মনে পড়ল বাড়ির কথা, বাড়ির সুখ সুবিধা, স্বাচ্ছন্দ্য। আর মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ম্যালেরিয়ার জ্বরের মতো বেড়ে গেল হোম সিকনেস। রঞ্জিতদাকে বললাম— "এ ঘরে আমি থাকতে পারব না। অন্য কোনো ভালো জায়গায় ব্যবস্থা করে দিন।" রঞ্জিতদা একটু সাহেবি কায়দায় হেসে অভয় দিলেন। ভাবটা — "ধীরে, বৎস, ধীরে। সবুরে মেওয়া ফলে।" পরে অবশ্য জেনেছিলাম যে আমাদের কল্পনামতো বিলেতে ঘর পেতে হলে হয় খুব অর্থবল নয়তো অর্থবল ও ভাগ্যবল দুইই থাকা চাই।

এবার বেরলাম লন্ডনের পথঘাট দেখতে। হোস্টেলের পাশেই আমার কলেজ— স্কুল অফ্ ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিস্। বিরাট বাড়ি ও তার পাশেই ইউনিভারসিটি অফ্ লন্ডনের প্রাসাদপুরী— প্রায় বিশতলা বাড়ি। লন্ডনের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাড়ি। সামনেই একটা পার্ক। নাম শুনলাম রাসেল স্কোয়ার। টিপটিপে বৃষ্টি, কনকনে ঠান্ডা ও আবছা অন্ধকারের মধ্যে জায়গাটা মোটেই ভালো লাগল না। অলোকদা প্রস্তাব করলেন, "ওহে প্রভাত, নিমাই-এর জন্য একটু স্ন্যাকের ব্যবস্থা করো।" 'স্ন্যাক' বলতে আমাদের কথায় জলখাবার বা 'চা-টা' খাওয়া। কাছাকাছি একটা মিল্কবারে ঢুকলাম। মিল্কবারে চা খাওয়া শুনতে বেমানান হলেও এই বারগুলোয় দুধ থেকে শুরু করে চা, কফি, কোকো ইত্যাদি কোনো পানীয়ই বাদ যায় না। এ ছাড়া কেক, স্যান্ডউইচ, পেস্ট্রি ইত্যাদি তো আছেই। ছোটো ছোটো গদিওলা টুলে বসে চা খাওয়া ও মিল্কবারের আবহাওয়া আমার কাছে সম্পূর্ণ নতুন লাগল।

রঞ্জিত ও অলোকদার কাজ থাকায় চলে গেলেন। প্রভাতদা রইলেন আমায় একটু শহর বেড়িয়ে দেখাতে। রাসেল স্কোয়ারের সামনে বাস স্টপ থেকে আমরা বাসে উঠলাম। গন্তব্যস্থল অল্ডউইচে ইন্ডিয়া হাউস। মনের অবস্থাটা যেন—ইন্ডিয়া যখন দেখা যাবে না অন্তত ইন্ডিয়া হাউসই দেখা যাক্।

বাসে উঠে প্রভাতদাকে কী একটা প্রশ্ন করলাম। কিন্তু আমার কথা শেষ হবার আগেই প্রভাতদা ফিসফিস করে বললেন, "চুপ! চুপ! এখানে খুব আস্তে কথা বলতে হয়। এমন ভাবে কথা বলতে হবে যে পিছনের সিটের লোকও যেন শুনতে না পায়।" ভাবলাম এ আবার কোন শিবঠাকুরের দেশ! এখানে জোরে কথা বললে পেয়াদা এসে পাকড়ে ধরে নাকি?

সত্যই লন্ডন শহর দেখলাম একেবারে নিস্তব্ধ। কোনো রকম হই হট্টগোল বা কর্মব্যবস্ততা নেই। সেদিন ছিল রবিবার। অফিস, দোকানপাট, খেলাধুলা, থিয়েটার সব বন্ধ। মনে হয় শহরটা ঘুমিয়ে রয়েছে। চারিদিকে একটা ঠান্ডা নিস্তব্ধতা। পরে অন্যান্য দিনের সঙ্গে রবিবারের অদ্ভুত পার্থক্য দেখে অবাক হয়ে গেছলাম। রবিবারের এই প্রাণহীনতা অনেক ইংরাজকেও অসহিষ্ণু করে তুলেছে, যার ফলে বিলেতে শুরু হয়েছে "ব্রাইটার সানডে ক্যাম্পেন।"

একটু পরেই বাস ইন্ডিয়া হাউসের সামনে এসে গেল। ইন্ডিয়া হাউস সেদিন বন্ধ। প্রভাতদা বললেন, "চল, তোমায় একটু টিউবে করে ঘুরিয়ে আনি।"

লন্ডনের বিখ্যাত "আন্ডার গ্রাউন্ড ট্রেন" বা টিউব রেলওয়ের কথা সবাই জানে। খানিকটা হাঁটার পর একটা টিউব স্টেশনে পৌঁছলাম। বিজ্ঞানের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি এই 'টিউব ট্রেন'। মাটির প্রায় ৬০।৭০ ফুট নীচে রয়েছে স্টেশনের প্লাটফরম আর ইলেকট্রিক লাইন। এই টিউব ট্রেনে করে লন্ডনের যে কোনো স্থান থেকে যে কোনো স্থানে অনায়াসে খুব অল্প সময়ে যাওয়া যায়। কয়েক মিনিট অন্তর ট্রেন আসছে ও যাচ্ছে। সমস্ত লন্ডন শহরে এই রকম অসংখ্য 'টিউব স্টেশন' রয়েছে। কোন স্টেশন থেকে কোন স্টেশনে কোন্ লাইন ধরে যাওয়া যায় তা প্রতি স্টেশনে ম্যাপের সাহায্যে বোঝানো রয়েছে।

লন্ডনের টিউব ও বাস ম্যাপ বিনা পয়সায় প্রত্যেকেই পেতে পারে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে লন্ডনে ট্রাম নেই। কয়েক বছর হল ট্রাম সার্ভিস উঠে গেছে।

'টিউব স্টেশনে' কত নম্বর প্লাটফরমে কী করে পৌঁছনো যায় তা 'অ্যারো' দিয়ে দেখানো রয়েছে। স্টেশন, প্লাটফরম, লাইনের নাম সবকিছুই প্রথমে লাগে ধাঁধার মতো। ওপরের রাস্তা থেকে নীচের প্লাটফরমে যাবার জন্য রয়েছে 'এস্কেলেটর' বা চলন্ত সিঁড়ি। বৈদ্যুতিক শক্তিতে একদিক দিয়ে সিঁড়ি নেমে যাচ্ছে আবার আর একদিক দিয়ে উঠছে। টিউব ট্রেন, এস্কেলেটর আর এইরকম বিস্ময়কর ব্যবস্থা কী করে সম্ভব হল তা ভেবে কূল পাওয়া যায় না।

ওপরে কাউন্টারে টিকিট কিনে এস্কেলেটরে করে নীচে প্লাটফরমে নামলাম। তখন যেন মনে হচ্ছিল কোথায় চলেছি, আরব দেশের কোনো গুহায় আলাদিনের মতো। একটু অপেক্ষা করার পরই একটা ট্রেন এল। আমরা উঠে পড়লাম। সবাই ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনের সব দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কাচের জানালাগুলো তো এমনিতেই বন্ধ। দশ পনেরো সেকেন্ড পরে ট্রেন ছাড়ল ও মাটির তলায় অন্ধকারে টানেলের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে মিনিট দু'তিনের মধ্যে পরের স্টেশনে এসে পড়ল।

আমরা এখানে নামলাম। এই স্টেশনে এস্কেলেটরের বদলে লিফটের ব্যবস্থা রয়েছে। লিফটে করে আবার ওপরে উঠে যখন রাস্তায় পৌঁছলাম তখনও আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি। প্রভাতদা বললেন, "খুব অবাক লাগল— নয়? এ সব দু'চার দিনেই অভ্যস্ত হয়ে যাবে। টিউব ট্রেনে যাতায়াত খুব সোজা। পথ হারাবার কোনো ভয় নেই। এ ঠিক 'সেফটি ক্যাশের' মতো বাক্সে পয়সাটি ফেলে দিলেই নিশ্চিন্ত, আর খরচ হবার ভয় নেই।"

সত্যই পরে দু'তিন দিন টিউবে যাতায়াত করেই বুঝেছিলাম টিউবে করে

যাতায়াত কত সুন্দর আর এই আন্ডার গ্রাউন্ড রেলওয়ে সিস্টেম কত সুপরিকল্পিত— যেন জ্যামিতির সরল রেখাটির মতো সহজ।

প্রভাতদা এবার আমায় নিয়ে গেলেন তাঁর এক বউদির বাড়ি। বাংলাদেশের বউদি বলতে যা বোঝায় ইনি ঠিক তাই। বউদি আমার পরিচয় পেয়ে বললেন, "এ যে দেখছি ছেলেমানুষ; এই ভূতের দেশে একলা থাকবে কী করে?" ভাবলাম হ্যাট-কোট পরে সাহেব হয়েছি তবু বউদি ছেলেমানুষ ভাবলেন কেন? কিছুক্ষণ গল্প হল। তারপর জলযোগ। আসবার আগে বউদি বললেন, "তুমি ভাই মাঝে মাঝে আমাদের এখানে এস।" বিদেশে এসে এই অপ্রত্যাশিত স্নেহের পরশ খুব ভালো লাগল। মনে পড়ল শরৎচন্দ্রের অমর কথা, "এই বাঙলা দেশের গৃহে গৃহে মা বোন, সাধ্য কি তাঁদের স্নেহের আকর্ষণ এড়িয়ে যাই।" শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিদেশেও যে কোনো বাঙালি গৃহে কথাটা কম সত্য নয়।

প্রভাতদা এবার আমায় নিয়ে ঢুকলেন একটা রেস্তোরাঁয়। আমি বললাম, "এই জলযোগের পর আবার রেস্তোরাঁ?" প্রভাতদা বললেন, "আজ রবিবার হে, রাত্রে শুধু 'হাই-টি' জুটবে। এখন খেয়ে নাও তা না হলে রাত্রে খিদেয় মরবে।" অর্ডার দেওয়া হল ফাউল কাটলেটের। কিন্তু ওই কাটলেট আমার আদৌ ভালো লাগল না। দোষটা অবশ্য ফাউলের নয়— রান্নার। প্রভাতদা তো প্রায় পথে বসলেন! ইটালিয়ান রেস্তোরাঁয় ফাউল কাটলেন ভালো লাগল না! তাহলে ইংরেজি রেস্তরাঁয় ঢুকলে করতাম কী? শেষ পর্যন্ত উপদেশ দিলেন, "দেশের খাওয়া ভুলে যাও। তা না হলে অনাহারে দিন কাটবে। ফাউল ভালো লাগল না— তুমি করবে কী হে?"

আমায় হোস্টেলে সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ পৌঁছিয়ে দিয়ে প্রভাতদা চলে গেলেন। এবারে ডক্টর পেরুমল ওরফে 'মামা'র অন্য রূপ দেখলাম। আমায় নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন ডাইনিং রুমে। বললেন, "আজ রবিবার, তাই রাত্রে 'হাই-টি'র ব্যবস্থা।" একটা টেবিলে বসিয়ে আমায় অন্যান্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। সবাই ভারতীয়। হাই-টি বলতে কেক, বিস্কুট, স্যান্ডউইচ, চা ইত্যাদি। রবিবার রাত্রে ডিনার কেউ খায় না। তার বদলে দুপুরে বাড়িতে খায় লাঞ্চ। শুধু 'টি' বলতে চা বোঝায়— অর্থাৎ তাতে 'টা'-এর ব্যবস্থা খুব উচ্চ ধরনের হয় না।

খাওয়া শেষ করে উপরে নিজের ঘরে এসে বাড়িতে চিঠি লিখলাম। চিঠি লেখা শেষ করে শুয়ে পড়লাম। ঘুম অবশ্য এল না। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম বাড়ির, বন্ধুবান্ধবদের আর লন্ডনের প্রথম দিনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

লন্ডনে পৌঁছেই একটা জিনিস অনুভব করেছি। যতদিন জাহাজে ছিলাম ততদিন বাড়ির ও দেশের কথা মনে হয়েছে রোজই। তবুও জাহাজে সম্পূর্ণ 'হোম সিক' হইনি কোনোদিন। কিন্তু ইউসটন স্টেশনে পৌঁছবার পরই মনটা ঘরমুখো হয়ে উঠেছে। চারিদিকে অপরিচিত মুখ ও নতুন পরিবেশ মনকে দুর্বল করে তুলেছে—